স্বামীজী
ও
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

।। শঙ্খনাদ প্রকাশন।।

প্রকাশক : শক্তিশেখর দাস
শঙ্খনাদ প্রকাশন
৩৬-এ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : শ্রী শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
যুগাব্দ ৫১১৪, বঙ্গাব্দ ১৪১৯
ইংরাজী ৯ আগষ্ট, ২০১২

দ্বিতীয় প্রকাশ : ১২ই জানুয়ারি, ২০১৩
যুগাব্দ ৫১১৪, বঙ্গাব্দ ১৪১৯

তৃতীয় প্রকাশ : বর্ষপ্রতিপদ
যুগাব্দ ৫১১৫, বঙ্গাব্দ ১৪১৯

@ প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রক : ক্যালকাটা গ্রাফিকস্ প্রাঃ লিঃ
৩ বি, মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাস্টেট
উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪

সহযোগ রাশি : দশ টাকা মাত্র

প্রাক্-কথন

১২ জানুয়ারি ২০১২ থেকে 'পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজে'র জগৎপূজ্যপাদ প্রতিনিধি সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা বছর ধরে বা আগামী দু-তিন বছর ধরে উৎসব পালন শুরু হয়েছে এবং হবে। এই উৎসব পালনের জন্য ভারত সরকার বহু বহু কোটি টাকা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে খরচ করছেন। বিশাল আয়োজন। গর্ব করার মতন, কিন্তু ১৫০ বছর পূর্ত্তির এই রাজকীয় আয়োজনের আড়ালে, পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গ্রামে-গঞ্জে, নগরে সর্বত্র স্বামীজীর প্রতিকৃতি দৃশ্যমান রাখার সমারোহের পেছনে রয়ে যাচ্ছে একটি অপপ্রয়াস। অপপ্রয়াসটি হল— স্বামীজীকে তথাকথিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রূপে প্রতিপন্ন করা। যদিও স্বামীজী হিন্দুত্ব, সনাতন ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে বলতে গিয়ে বারবার বলেছেন যে, এগুলি সমস্তই সমার্থক। এই অকপট চিন্তাধারা নিয়েই তিনি বিশ্বজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। সেদিন ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, চিকাগো শহরের কলম্বাস হলে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে দেওয়া কালজয়ী ভাষণে স্বামীজী স্পষ্টই বলেছিলেন— "সর্বধর্মের প্রসূতি-স্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম... যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভূক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

পরবর্তী সময়ে স্বামীজী পুনর্বার বলেছেন, "আমরা হিন্দু। আমি এই হিন্দু শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।.... যদি বর্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোনও মন্দ জিনিষ বুঝায়, বুঝাক। এস, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে।" (৫/১৬৯)

'হিন্দু' শব্দটির ব্যবহারে স্বামীজী ছিলেন অনমনীয়। ছিলেন দৃঢ় দৃপ্ত এবং দুর্নিবার। আরও স্পষ্ট ভাষায় স্বামীজী বলেছেন, 'আমি এই হিন্দু জাতির মধ্যে একজন অতি নগন্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতি, আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু পরিচয় দিতে গর্ব

অনুভব করিয়া থাকি।' (বিবেকানন্দ রচনাবলী, ১ম সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

সেই হারানো গৌরব স্বামীজী নিজেও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারও তাঁর পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করেছিলেন। ডাঃ হেডগেওয়ার স্বামীজীর স্বপ্নকে সাকার করতে— "একটা সংগঠন"-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যে সংগঠন স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যেকটি বাণী-রূপকে আক্ষরিক অর্থে ভারতীয় জনজীবনে কার্যকরী করে তুলছে। এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে স্বামীজীর চিন্তাচয়নই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্মসূচী, আর এস এসের কর্মসাধনা।

আর এস এস যে স্বামীজীর চিন্তনকেই সমাজে ব্যবহারিক প্রয়োগ করছে তার বিস্তৃত প্রামাণিক ব্যাখ্যা এই পুস্তকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'হিন্দু' শব্দের যে 'মন্দ' অর্থ সমাজে প্রচার করা হচ্ছে, আশা করা যায় এই পুস্তিকার মাধ্যমে কিছুটা হলেও তার উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও তার কাজের মাধ্যমেই প্রমাণ করে চলেছে যে, 'হিন্দু' শব্দের আর কোনও উচ্চতর প্রতিশব্দ কোনও ভাষাতেই নেই।

আমাদের বিশ্বাস, সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের পিছনে প্রেরণাপুরুষের সত্য-চিন্তন, দুটো বিষয়কে একই জায়গায় পেয়ে অনুসন্ধানী পাঠক উপকৃত হবেন।

জন্মাষ্টমী, ৫১১৪

প্রকাশক

স্বামীজী ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে যদি কেউ সঙ্ঘ-ভাবনা অর্থাৎ সঙ্ঘের মতই ভারতব্যাপী হিন্দু সমাজের সংগঠনের জন্য কোনও সংস্থার কথা ভেবে থাকেন তবে তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আবার স্বামীজী ভিন্ন স্বামীজীর ভাবনা, চিন্তা ও বাণীকে সঠিকভাবে যদি কেউ বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ শুরু করেন ও তা সমগ্র ভারত তথা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তিনি হলেন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

কেশব হেডগেওয়ারের জন্ম ১৮৮৯ সালের ১লা এপ্রিল, নাগপুর শহরে। অন্যদিকে স্বামীজীর তিরোধান হয় ১৯০২ সালের ৪ জুলাই। অর্থাৎ হেডগেওয়ারের বয়স যখন মাত্র ১২-১৩ বছর সেই সময় স্বামীজী ইহলোক ত্যাগ করেন। বালক কেশবের পক্ষে স্বামীজীর সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভব ছিল না, কারণ, একজনের কেন্দ্র ছিল ভারতের পূর্বপ্রান্তের কলকাতায়, অন্যজন ছিলেন ১২০০ কিলোমিটার দূরে দেশের মধ্যস্থল নাগপুর শহরে।

।। স্বামীজীর সংগঠন চিন্তা ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা।।

স্বামীজীর সঙ্গে কেশবের কখনও দেখা না হলেও স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কেশবের পরিচয় ঘটে (১৯১০-১৪ সালে) কলকাতায় ডাক্তারী পড়ার সময়। জন্মজাত দেশভক্ত কেশবকে ভাবিয়ে তোলে স্বামীজীর রচনা ও বাণী। ছাত্র নরেন যেমন তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতেন, জনে জনে প্রশ্ন করতেন, 'তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছো?' তেমনভাবেই ছাত্র কেশব জনে জনে প্রশ্ন করতেন, 'কেন এই বিদেশী পরাধীনতা?' জিজ্ঞাসা করতেন আমাদের দেশে এত বীর, যোদ্ধা থাকতেও বিদেশ থেকে আসা হাতে গোনা কিছু আক্রমণকারী কিভাবে এদেশে আধিপত্য বিস্তার করল'?

নরেন যেমন উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন, একজন নিরক্ষর লোক-শিক্ষকের কাছে, তেমনই কেশব উত্তর খুঁজে পেলেন স্বামীজীর বাণীর মধ্যে। 'সংগঠন, সংগঠন আর সংগঠন'— "একটা Power of Organization (সঙ্ঘ চালাবার শক্তি) চাই বুঝেছ? তোমাদের ভিতর কারুর মাথায় ততটুকু ঘি আছে কি? যদি থাকে তো বুদ্ধি খেলাও দিকি"..... (বাণী ও রচনা, ৬/৩৫৬)।

বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন কেশব, বুঝেছিলেন— ভারতের এই অবস্থার জন্য

কোনও বিদেশী শক্তি দায়ী নয়, অসংগঠিত ভারতই বিদেশীদের আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করেছে। স্বামীজী বলেছেন— 'তোমাদের জাতির মধ্যে organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ওই এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ'— (৭/১৩৬)। "একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ— চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর কী রূপে প্রভুত্ব করিতেছে? ইহার উত্তর কি? এই চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারেন, এবং উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকের ভাব ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই সংহতি, শক্তি সংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একাগ্র মিলন।" (বাণী ও রচনা, ৫/১৯৭) বুঝেছিলেন কেশব— "সংগঠনই শক্তি"। ত্রিশ কোটি লোকের সংগঠন, এদের মিলিত ইচ্ছাশক্তিই পারে সব সমস্যার প্রতিকার করতে, পারে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে। "ভারতের ভবিষ্যৎ ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে"— ভবিষ্যৎ ভারতের নির্মাণে সমাজকে সংগঠিত করার সংকল্প নিলেন কেশব। কাদের সংগঠন, কিভাবে সংগঠন, কোথায় সংগঠন— উত্তর খুঁজেছেন কেশব। পথ খুঁজে পেয়েছেন স্বামীজীর রচনার মধ্যেই।

"আমার কার্যপ্রণালী, হিন্দুদের দেখান যে তাহাদের কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দী ব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব দূর করিতে হইবে। অবশ্য মুসলমান গণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল, তাহার কারণ তখন ছিল জীবন মরণের সমস্যা, উন্নতির সময় ছিল না। এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই, এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে— স্বধর্মত্যাগী ও মিশনারীগণের উপদিষ্ট ধ্বংসের পথে নয়, আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। বহু শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্মাণ কার্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাস্থানে সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্যপ্রণালী। এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই" (বাণী ও রচনা, ৭/৬২)।

সন্দেহ কেশবেরও ছিল না। আসমুদ্র হিমাচল বহুধা বিভক্ত পরাধীন হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার গুরুদায়িত্ব বহন করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন।

একধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি— । কিন্তু একাজের জন্য প্রয়োজন বলিদান। স্বামীজী বলেছেন, "ভারতমাতা সহস্র যুবক বলি চাহেন" (৬/২৮২)। এ বলি হল ধূপের মতো নিজেকে জননীর সেবায় নিঃশেষিত করা। কেশব নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ধন, যশ, মান, সামাজিক প্রতিপত্তি, একজন ডাক্তারের যা কিছু প্রাপ্য সব কিছু উপেক্ষা করে নিজেকে জননীর সেবায় নিবেদন করেছেন। 'শিরদার তো সরদার'। স্বামীজী বলেছেন, "ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।" (বাণী ও রচনা, ৬/১৯৪)

কেশব আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে, ধন, যশ, মান, প্রতিপত্তি সবকিছু উপেক্ষা করে নিজেকে বলি দিয়েছেন। স্বামীজী ছিলেন তৎকালীন সমাজে একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ জীবন নিঃশর্তে সমর্পণ করেছেন এক নিরক্ষর গুরুর চরণে। সহায়-সম্বলহীন স্বামীজী লোকবল, অর্থবল, নামগোত্রহীন অবস্থা থেকে কেবলমাত্র গুরুদেবের আশীর্বাদ ও নিজ আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে একাকী সব বাধা উপেক্ষা করে বিদেশের মাটিতে হিন্দুত্বের বিজয়শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। 'বিপ্লবী হিন্দু সন্ন্যাসী' হিসাবে বিশ্বসভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, অথবা বলা ভালো, জয় করেছিলেন সমগ্র বিশ্ব।

"পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সব কিছু করতে পারো। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করতে যথোচিত যত্নবান হও না বলেই বিফল হও। যখনই কোনও ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তার বিনাশ হয়" (১/১৩২)।

।। স্বামীজীর স্বপ্নের সংগঠন আর এস এস।।

সহায়-সম্বলহীন কেশব সেই আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করেই কাজে নামলেন। অর্থহীন, নামহীন কেশব কোনও বড় মাপের বা বয়সের মানুষকেও সঙ্গী হিসাবে পাননি। স্বামীজীর মতো কেশবও নির্ভর করেছিলেন তরুণ যুবকদের উপর। "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন করো। তোমাদের উৎসাহ-অগ্নি তাদের ভিতর জ্বালিয়ে দাও। আর ক্রমশ এই সঙ্ঘ বাড়াতে থাকো। এর পরিধি বাড়তে থাকুক" (বাণী ও রচনা, ৬/৩৩৮)। "আমি বিশ্বাস রাখি আধুনিক যুব সমাজের উপর। আমার কর্মীরা তাদের মধ্য থেকেই আসবে। সিংহের মতো তেজে তারা

দেশের সব সমস্যাগুলির সমাধান করবে" (বাণী ও রচনা, ৯/৩০৭)। সংগঠন তৈরির পরিকল্পনা ও যুবক তরুণদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে উৎসাহবহ্নি জ্বালাবার কাজ শুরু করলেন কেশব— ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

শুরু তো করলেন, কিন্তু কি হবে সংগঠনের নাম? বহু মানুষের সঙ্গে কথা বললেন। পরামর্শ, আলোচনা করলেন। অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ মাস পর (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬) সিদ্ধান্তে এলেন। এখানেও সম্ভবত স্বামীজীর বাণীই তাঁর প্রেরণা ছিল।

"একটি সঙ্ঘের বড় প্রয়োজন, যা হিন্দুদের পরস্পরকে সাহায্য করতে ও ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে।" (বাণী ও রচনা, ৭/৬৮) এইরূপ একটি জাতির মধ্যে এমন একদল লোক সৃষ্টি করা, যাহারা মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য স্নেহ, ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। এই দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে ও এই অদ্ভুত উদার ভাব অপ্রতিহত বেগে ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে।" (পত্রাবলী, ৬/৩১১)

রাষ্ট্রের জন্য একটি সংগঠন বা সঙ্ঘ এবং সেই সঙ্ঘের কর্মীগণের গুণাবলী স্বামীজীর বাণীতে প্রতিফলিত। এই বাণীরই প্রত্যক্ষ কৃতিরূপ দিয়েছিলেন ডাঃ হেডগেওয়ার। শুরু হয়েছিল 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ', যা অতি সামান্য আকারে শুরু হলেও অচিরেই এই অদ্ভুত ভাব সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যপ্ত হয়েছিল। এখানেও স্বামীজীর বাণীকেই অবলম্বন করেছিলেন কেশব।

"কাজের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না। কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়। নেতা হতে যেও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর" (৭/৬)। নেতৃত্বের আহ্বান ছুঁড়ে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন কেশব। সস্তা রাজনীতির স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে সমাজ সংগঠনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আপনার সুখ, আপনার দুঃখকে মিথ্যা করে স্বার্থমগ্ন সমাজ জাগরণের কাজই চয়ন করেছিলেন।

"মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস মূঢ় বিজ্ঞ জনে - প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস" - স্বামীজী ও ডাঃ হেডগেওয়ার উভয়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছিল।

" হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস করো যে, তোমরা বড় বড় কাজ

করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না। এমনকী আকাশ থেকে প্রবল বজ্রপাত হলেও ভয় পেয়ো না, খাড়া হয়ে ওঠো, কাজ কর" (৬/৩৭৪)।

মানুষের স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নীচতা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সরকারের দমন, পীড়ন, বিরোধিতা কিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি কেশবকে। মাত্র পনের (১৯২৫-১৯৪০) বছরের মধ্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ নাগপুরের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল। এ যেন স্বামীজীর ভাবনারই অবিকল বাস্তবরূপ। ১৮৯৪ সালের ১৯ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী লিখেছেন, "আমার কথা কি বুঝিয়াছ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইউরোপের সমাজের (সংগঠন) মতো একটি সমাজ (সংগঠন) গড়িতে পার। আমার বিশ্বাস, ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায় **'মধ্য ভারতে'** একটি উপনিবেশ স্থাপন। যাহারা তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে কেবল তাহাদের সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার করা। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার **'শাখা'** স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর। কোনওরূপ সামাজিক সংস্কারের কথা এখন প্রচার করিও না।" (পত্রাবলী, বাণী ও রচনা, ৭/২৭) অর্থাৎ অন্য কোনও দিকে নজর না দিয়ে এখন কেবল মাত্র সংগঠন করার দিকেই মন দেবার কথা বলেছিলেন স্বামীজী।

কেশব স্বামীজীর নির্দেশিত পথেই সন্তর্পণে পা রেখেছেন। অনেক অবজ্ঞা, উপেক্ষা সহ্য করেও কোনও বিপ্লব, কোনও সামাজিক সংস্কারে সঙ্ঘকে ঠেলে দেননি। ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তিনি স্বয়ং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু সব আন্দোলন থেকে সঙ্ঘকে দূরে রেখেছেন। সঙ্ঘের সংগঠনকে সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্য তিনি কখনও অর্থের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। "কে কোথায় দেখিয়াছে টাকায় মানুষ করে। মানুষই চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যাহা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে। উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।" (বাণী ও রচনা, ৮/৬)

বিবেকানন্দের বাণীই ছিল তাঁর অবলম্বন। তারুণ্যের শক্তিতে বিশ্বাস করে

তাদের উৎসাহে তাদের শক্তিতে নির্ভর করেই সঙ্ঘ সর্বভারতীয় রূপ পেয়েছিল। "মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষে সব করে, টাকায় কি করতে পারে। মানুষ চাই, যত পাবে ততই ভাল।" (বাণী ও রচনা, ৭/২৯৫) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাধ্যমে সেই মানুষ তৈরির দেশব্যাপী প্রয়াস শুরু করলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

।। স্বামীজীর বাণী সঙ্ঘের বিচারধারা।।

সংগঠন তৈরি হল, বিচারধারা তো তৈরিই ছিল— "সংগঠিত হিন্দু - শক্তিশালী ভারত"। অতএব হিন্দু সমাজ সংগঠন। কিন্তু সিদ্ধান্ত— এখানেও স্বামীজীকে অবলম্বন করেছেন কেশব। 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'। স্বামীজী বলেছেন— "কোনও লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করলে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রুর বৃদ্ধি হয়।" (বাণী ও রচনা, ৯/৩১৪) ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বামীজীর বাণী কতটা নিষ্ঠুর সত্য। যখনই দেশের কোনও অংশে হিন্দুর সংখ্যা কমে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে, তখনই তা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা হবার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে আফগানিস্তান (গান্ধার), পাকিস্তান, বাংলাদেশই হোক (বিচ্ছিন্ন হয়েছে), অথবা আজকের কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ড বা মিজোরাম (বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে)। আমাদের মধ্যে ক'জনেরই বা তা নিয়ে মাথাব্যাথা আছে, কষ্ট আছে, দুঃখ আছে?

স্বামীজী তার শিষ্যকে প্রশ্ন করছেন— যদি কেহ আপনার মা'কে বিদ্রূপ করিত তবে আপনি কি করিতেন?

শিষ্য উত্তর দিয়েছেন— আমি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উচিত শিক্ষা দিতাম।

এখানেই গর্জে উঠেছেন স্বামীজী— ঠিক, কিন্তু আপনার প্রকৃত জননীসম নিজের ধর্মের প্রতি যদি ঠিক ওইরকম সুতীব্র অনুভূতি থাকিত, তবে কোনও হিন্দুভাই খৃস্টান হইতেছে এইরূপ দৃশ্য কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না।

বস্তুত আপনি ইহা প্রতিদিন ঘটিতে দেখিলেও সম্পূর্ণ নির্বিকার। কোথায় আপনার বিশ্বাস, কোথায় সেই দেশপ্রীতি? খৃস্টান মিশনারীগণ আপনার সম্মুখেই হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করিতেছে, তবু আপনাদের মধ্যে এমন ক'য়জন আছেন, যাহারা ইহার বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইবেন? যাহাদের রক্ত ন্যায়ের মর্যাদা

রক্ষার জন্য তীব্র জ্বালায় উদ্বেলিত হইবে।' (স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্র চিন্তা - ৯৩)

বুঝেছিলেন কেশব স্বামীজীর বাণীর সত্যতা। কেবল মাত্র কয়েকজনকে তীব্র জ্বালায় উদ্বেলিত করা নয়, সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে স্বাভিমানবোধের, স্বধর্ম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানোই হবে কাজের প্রাথমিকতা। স্বামীজী বলেছেন, "স্বদেশ হিতৈষী হও। যে জাতি অতীতকালে আমাদের জন্য এত বড় বড় কাজ করিয়াছে, সেই জাতিকে প্রাণের সহিত ভালোবাসো।" (বাণী ও রচনা, ৫/৬৮) তাই সঙ্ঘের শুরুর প্রথমদিন থেকেই কেশব স্বপ্ন দেখতেন, আসমুদ্র হিমাচল হিন্দু সংগঠনের, স্বপ্ন দেখতেন স্বাভিমানী, দেশভক্ত, উন্নত মস্তক হিন্দু সমাজের। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেননি কেশব, উল্টে এ স্বপ্ন তাঁকে ১৫ বছর পর্যন্ত ঘুমাতেই দেয়নি।

বিচারধারা, সিদ্ধান্ত তো আগেই ছিল, কিন্তু সংগঠন করার উপায় কি? কেমন ভাবে সংগঠিত করা যায় জাত-পাত, ভাষা-সম্প্রদায়, প্রাদেশিকতায় দীর্ণ এই হিন্দু সমাজকে। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, মারাঠী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, শূদ্র, হরিজন, দলিত— সব জাতির পরিচয় দিতে লোকে গর্ববোধ করলেও হিন্দু হিসাবে পরিচয় দিতে লোকের লজ্জা, ভয়! Call me an ass not Hindu। হিন্দু ডাকের থেকে গাধা ডাক লোকের বেশি পছন্দ।

স্বামীজী বলেছেন— "আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে 'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময়, সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, অথবা চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবসিত হইবে। অথবা উহা দ্বারা পদদলিত ধর্মপ্রাণ জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমান কালে হিন্দু শব্দে কোনও মন্দ জিনিস বুঝায়, বুঝাক। এসো, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোনও ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে।" (৫/২৬৯)

'হিন্দু সমাজ সংগঠন? অবাস্তব, অসম্ভব'— একথা যখন দেশের জাতীয় নেতৃত্ব মনে করতেন, মনে করতেন 'হিন্দু' ডাক সংকুচিত, পশ্চাদগামী, তখন স্বামীজীর বাণীকে পাথেয় করে কেশব সমাজ সংগঠন শুরু করেছিলেন। স্বামীজী বলেছেন, "হিন্দুরা ধর্মের ভাবে খায়দায়। ধর্মের ভাবে ঘুমোয়, ধর্মের ভাবে চলাফেরা করে, ধর্মের ভাবে বিয়ে করে। ধর্মের ভাবে দস্যুবৃত্তি করে.... এ জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি ধর্ম। এই ধর্মের উপর হাত পড়েনি বলেই জাতি এখনও বেঁচে আছে।" (বাণী ও রচনা, ১০/১০২)। যে সময় ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব হিন্দু

হওয়াকে দুর্ঘটনা বলে মনে করতেন, সেই তমসাময়, দিশাহীন সময়ে অর্থবল, লোকবল, নেতৃত্ব ছাড়া কেবলমাত্র নিজ পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে স্বামীজীর নির্দেশিত পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। যাত্রা শুরু করলেন, লক্ষ্য স্থির, কিন্তু পথ? বিশাল বিক্ষিপ্ত হিন্দু সমাজ সংগঠনের মাধ্যম কি হবে?

স্বামীজী বলেছেন, "সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার ভাবটা আমাদের চরিত্রে একেবারেই নেই, এটা যাতে আসে তার চেষ্টা করতে হবে। এটা করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সবসময় তোমার ভাইয়ের মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সবসময়ই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এই হল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার গুপ্ত রহস্য।" (আমার ভারত, অমর ভারত- ৩৭)

সঙ্ঘবদ্ধ অর্থাৎ সংগঠিত করার, ঈর্ষা দূর করার, সকলকে ভাই বলে মেনে নিয়ে নেতার আজ্ঞায় শান্তভাবে কাজ করার জন্য চাই বড়, উদার মন। আমি নয়, তুমি, ক্ষুদ্র 'আমি'র বিনাশ এবং প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ।" (আমার ভারত - অমর ভারত, ৯২) ক্ষুদ্র আমিকে বিসর্জন দিয়ে এক বৃহৎ আমি অর্থাৎ আমরা-তে পরিবর্তিত হবার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত চর্চা, অভ্যাস। এই নিত্য অভ্যাসই গড়ে তুলতে পারে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন।।

।। স্বামীজীর নেতৃত্ব ভাবনা ও সঙ্ঘ।।

"ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল করার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নেই। যতদিন না এই ঈর্ষা, দ্বেষ দূর হয়... ততদিন একটা সমাজ-সংহতি হতেই পারে না। ততদিন আমরা এই রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকব। কিছুই করতে পারব না।" (আমার ভারত, অমর ভারত - ৩৭)

"যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিজেই তো দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি?" (বাণী ও রচনা, ৯/২৯৯)

এমন মানুষ তৈরির জন্য প্রয়োজন নিত্য প্রতিদিন সাধনার; সংস্কারের। নিজের ছোট ছোট দোষ, স্বার্থ ভাবনা, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা সরিয়ে রেখে দেশ তথা রাষ্ট্র ভাবনায় উদ্বেলিত হবার পরিমণ্ডল নির্মাণের।

কেশবও শুরু করলেন নিত্য অনুশীলনের কাজ, নিত্য সংস্কার দেবার কাজ, যেখানে অল্প সময়ের জন্য হলেও মানুষ দেশের কথা, দেশের উজ্জ্বল অতীত কাহিনী, দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনা করতে পারবে। ভাবতে শিখবে দেশ কি? জানতে পারবে তার পূর্ব পুরুষকে। ভালবাসতে পারবে দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে। না কাউকে অনুসরণ করে কাজ শুরু করেননি কেশব। শুরু করলেন সম্পূর্ণ স্বকীয়, স্বদেশীয় পদ্ধতিতে। সমাজ সম্পর্কে মানুষের মনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ভালোবাসা নির্মাণের, সমাজ সংগঠনের এক অনুপম মাধ্যম। স্বামীজী বলেছেন, "অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। যখন মানুষ নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন। এই আমি হিন্দু জাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির, আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর, আমি যে তোমাদের স্বদেশীয়, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্ব পুরুষগণের নামে লজ্জিত না হইয়া তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর; অনুকরণ করিও না। যখনই তোমরা অপরের ভাবানুসারে পরিচালিত হইবে, তখনই তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা হারাইবে। এমনকি, আধ্যাত্মিক বিষয়েও যদি তোমরা অপরের আজ্ঞাধীনে কার্য কর, তোমরা সকল শক্তি, এমনকি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিবে।" (বাণী ও রচনা, ৫/২৮৩-২৮৪)

।। বিপরীত পরিবেশ ও সঙ্ঘ।।

স্বামীজীর চিন্তা, কর্ম, অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরিবেশে কাজ শুরু করেছিলেন কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। যে সময় জাতীয় নেতারা নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করতেন। তারা বলতেন "By education I am a christain, by culture I am a muslim and I am a Hindu by accidental birth" । অন্যদিকে স্বামীজীর অভিমত ছিল, "হিন্দু নাম

লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি— হয়তো উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। এস, সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি একসঙ্গে ডুবিয়া মরি।" (বাণী ও রচনা, ৫/৩৬৫)

ভারতের রাজনীতির জাতীয় আকাশের উদীয়মান নেতারা যখন হিন্দুত্ব সম্পর্কে এমন লজ্জাজনক মনোভাব প্রকাশ করতেন, ঠিক সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

স্বামীজী বলেছেন, "বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরেও যাহা করিতে পারে না, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরল সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে।" (বাণী রচনা ৭/১২৭)

স্বামীজীর চিন্তন সার্থক করে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরল, সঙ্ঘবদ্ধ, ইস্পাতকঠিন স্নায়ুর যুবক স্বামীজীর ইচ্ছা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজকে ছড়িয়ে দিল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। সহস্র বছরের অপমানিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত জাতির বুকে এনে দিল আশার বাণী। 'হিন্দু সংগঠন অসম্ভব, অবাস্তব'— এমন হতাশ ভাবনাকে পরাস্ত করে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে জ্বলে উঠলো হিন্দু সমাজ সংগঠনের আলো। সঙ্ঘের প্রচারকেরা বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছে দিল স্বামীজীর বাণী— "ওঠো, জাগো, আর ঘুমিও না। সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, একথা বিশ্বাস করো, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।" (বাণী ও রচনা, ৯/৬)

নিত্য অনুশীলন, প্রত্যহ সংস্কার গ্রহণ, প্রতিদিনের মিলনের ফলেই গড়ে উঠবে সংগঠিত, শক্তিশালী সমাজ। —"তোমাদের স্নায়ু সতেজ করো। আমাদের আবশ্যক লৌহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু। আমরা অনেকদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি; এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও।" (বাণী ও রচনা, ৫/৮৮)

আমাদের উপর হাজার বছরের বিদেশী আক্রমণের সময় যাঁরা আদর্শ ও ধর্মের রক্ষার জন্য বলিদান করেছেন, যে অসীম দৃঢ়তা ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়েছেন, যে ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তাদের মধ্যে নির্ভয়তা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সমাজের জন্য প্রেম, জীবনের সার্থকতার জন্য আজীবন পরিশ্রম করার মতো প্রেরণা ছিল, তাদের স্বার্থ চিন্তা ছিল না। এই প্রেরণা ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ

সকলের মধ্যে ছিল। বলিদানের সুযোগ এলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হতেন। মহিলারা নিজেদের সতীত্ব রক্ষার জন্য হাজার হাজার সংখ্যায় জহর ব্রত পালন করতেন।

।। স্বামীজী, শক্তি সাধনা ও সঙ্ঘ।।

মুসলমান আক্রমণের সময় এসব হয়েছে, কারণ তারা আমাদের শ্রদ্ধাবিন্দু, সংস্কার-কেন্দ্র নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু সেই সময় হিন্দু সমাজ একতাবদ্ধ ছিল না। থাকলে আজ ইতিহাস অন্যরকম হত। আবার এই হাজার বছর পরে কেউ যদি সেই কাজ অর্থাৎ ভাষণ দ্বারা সংস্কার ও সংগঠনের কাজ করতে চায়, তবে তাকে বিফল হতেই হবে। কারণ, সেই পবিত্র শুদ্ধ অন্তঃকরণ, নির্মল বুদ্ধি, বলিষ্ঠ শরীর আজ আর পাওয়া যাবে না। আজ শক্তিশালী লোকেরা বুদ্ধিহীন, বিচারহীন, মূল্যবোধহীন, অন্যদিকে বুদ্ধিমান লোকেরা ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল। তারা অনেক জানেন, ভাষণ দেন, লেখেন, উপদেশ দেন, কিন্তু সেগুলি পালন করার মতো শক্তি ও ধৈর্য তাদের নেই। বলিদানের কথা শুনলেই তারা পলায়ন করেন। "আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না। আমাদিগকে সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে।" (বাণী ও রচনা, ৫/১০৩) এ থেকে উত্তরণের জন্য স্বামীজীর পরামর্শ— Brain ও muscles (মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী) সমানভাবে developed (সুগঠিত, পরিপুষ্ট) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet। (লোহার মতো শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হয়) (বাণী ও রচনা, ৯/৯)

কারোর কারোর বুদ্ধি আছে, কিন্তু শারীরিক রূপে তারা দুর্বল। শুধু মনের নয়, শরীরের সংস্কারের জন্য বিপ্লবীরা অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর পার্টির মাধ্যমে নিয়মিত লাঠিখেলা ও মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেবলমাত্র আবেগ দ্বারা কাজ হবে না।

কাজ যে হবে না তা জানতেন স্বামীজী, তাই বলেছেন, " দেহটাকে (Physique) আগে গড়ে তোল, তবে তো মনের ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and

mind must run Parallel (দেহ ও মন সমানভাবে চলবে)। শরীরটা সবল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে।" (বাণী ও রচনা, ৯/১১১-১১২)।

সবল সমাজ, সমর্থ জাতি নির্মাণের জন্য সঙ্ঘকাজের অন্যতম মাধ্যম হল শাখা, যেখানে শক্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়ের বিকাশ ঘটে। মানুষ বিকশিত হয়। নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম খুঁজে পায়।

এখানেও স্বামীজীকে অনুসরণ করেছেন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা— স্বামীজী বলেছেন, "হে আমার যুবক বন্ধুরা। তোমরা সবল হও, তোমাদের কাছে এই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে। আমাকে অতি সাহসের সঙ্গে এ কথাগুলো বলতে হচ্ছে; কিন্তু না বললেই নয়। আমি তোমাদের ভালোবাসি। আমি জানি, সমস্যাটা কোথায়। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে।" (বাণী ও রচনা - ৫/১০৩, আমার ভারত - অমর ভারত - ১০০)

।। সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং।।

সঙ্ঘের শাখার মাধ্যমে এমন সংস্কারিত হাজার হাজার ব্যক্তি নির্মিত হয়েছে, আজও হচ্ছে। যাদের মানসিকতা এক, এক আদর্শ, এক স্বর, একই বাণী, একই আচরণ, একটাই ভাবনা নিয়ে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াচ্ছে। একই সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে।

স্বামীজীর চিন্তায়— "আমার মনে অথর্ববেদ-সংহিতার সেই অপূর্ব শ্লোক ভেসে উঠছে— "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ / দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।" — তোমরা সকলে এক অন্তঃকরণবিশিষ্ট হও, কারণ প্রাচীনকালে দেবতারা একমনা হয়েই তাঁদের যজ্ঞভাগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।" (আমার ভারত অমর ভারত, ১০৪)

সমাজকে সংগঠিত করার পূর্বে প্রয়োজন ব্যক্তিকে সংস্কারিত করা। এটাই হল 'একেবারে মূল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা। নিজেদের দ্বারা নিজেদের উন্নতি সাধন করা। সংস্কার হল বীজের মতো, কিন্তু মানুষ গাছ নয়, যে ইচ্ছামতো তাকে কেটে ছেঁটে ফেলা যাবে। মানুষের নিজের মধ্যেই বিশেষ কিছু সংস্কার

থাকে, গুণ থাকে, যেগুলির পরিবর্তন করা খুব সহজ নয়। এই পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হল নিয়মিত অভ্যাস। অভ্যাসের দ্বারা সংস্কারের দ্বারা সেই বীজকে বিকশিত করে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত করা সম্ভব, তখন তার শক্তি অনন্ত গুণ বৃদ্ধি পাবে, তখন তাকে বিনাশ করাই অসম্ভব হবে।

"আমার মূল মন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এক একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা"। সঙ্ঘের সাধনা হল, "ব্যক্তি ব্যক্তি মে জাগায়ে রাষ্ট্র চেতনা, জনমন সংস্কার করে এহি সাধনা।" স্বামীজী বলেছেন— "সংস্কারকদের আমি বলতে চাই, আমি তাদের যে কোনও জনের চেয়ে বড় সংস্কারক। তারা একটু-আধটু সংস্কার করতে চান, আর আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কারের পদ্ধতিতে। তাদের পদ্ধতি ধ্বংসের, আমার পদ্ধতি গঠনে।" (আমার ভারত - অমর ভারত, - ৩১)

।। ব্যক্তি নির্মাণ ও সঙ্ঘ।।

সঙ্ঘের কাজের পদ্ধতিও ব্যক্তি নির্মাণের। সঙ্ঘ স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী। কেবলমাত্র জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগানোর কাজ করে সঙ্ঘ, ব্যক্তির বিকাশে কর্তৃত্ব করে না। 'তুমি খারাপ একথা কখনও সঙ্ঘ বলে না। সঙ্ঘ বলে তুমি ভালো ছিলে, কিন্তু তোমাকে আরও ভালো হতে হবে।'

"ভারতের কার্যপ্রণালী কি ধরনের হওয়া উচিত?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছেন, "প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীরটা যাতে সবল হয় তেমন শিক্ষা দিতে হবে। এইরকম বার জন পুরুষ সিংহ জগৎ জয় করবে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালের দ্বারা তা হবে না। দ্বিতীয়, যত বড়ই হোক না কেন, কোনও ব্যক্তির আদর্শ অনুকরণ করতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।" (বাণী ও রচনা, ৯/৩১৭)

সকলকে কাজের লোক করে গড়ে তোলা, শরীরটাকে সবল করার শিক্ষা সঙ্ঘ শাখায় দেওয়া হয়। কিন্তু একই সঙ্গে সতর্ক ডাঃ হেডগেওয়ার ব্যক্তি পূজার অথবা কোনও বড় ব্যক্তির অনুকরণও কখনও করেননি। সবকিছু নিজের পক্ষে থাকার পরেও নিজেকে সঙ্ঘের গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেননি।

১৯ নভেম্বর ১৮৯৪ আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামীজী লিখেছেন, "কেহ যেন নিজেকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া স্ফীত না হন। এমনকি আমাদের

মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না; গুরুগিরি চলিবে না।"

কোনও ব্যক্তিকে গুরুর আসনে রাখেননি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু হিন্দু চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ 'ত্যাগের' প্রতীক গৈরিক বর্ণের পতাকাকে সঙ্ঘ গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছে। কবিগুরুর ভাষায়, 'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও'। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার বলেছেন— "সঙ্ঘের কাজ ও তাহার বিচারধারা আমাদের নতুন কোনও আবিষ্কার নহে। সঙ্ঘ আমাদের পরম মিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি, আমাদের স্বতঃসিদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং অতীত কাল থেকে প্রচলিত পরম পবিত্র ভাগবা ধ্বজকে সেই একই রূপে সকলের সামনে আনিয়াছে..."

।। স্বামীজীর বাণী ও সঙ্ঘের প্রার্থনা।।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রার্থনা সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সঙ্ঘের শাখায় আগত শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত স্বয়ংসেবকের অন্তরের শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভাবে তা নিয়মিত উচ্চারিত হয়। সঙ্ঘের প্রার্থনার প্রথম স্তবক যেন দেশ সম্পর্কে স্বামীজীর দিব্য দর্শনেরই প্রকাশ—

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে — ত্বয়া হিন্দুভূমে সুখং বর্ধিতোহম্।
মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে ত্বদর্থে — পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে।।

(হে বাৎসল্যময়ী মাতৃভূমি, তোমায় সর্বদা প্রণাম করি— এই সেই হিন্দুভূমি, আমি যেখানে সুখে বেড়ে উঠেছি। এই মঙ্গলময়ী, পুণ্যভূমির জন্য আমার জীবন নিঃশেষিত হোক, হে মা তোমাকে বারবার প্রণাম)

স্বামীজীর বর্ণনায়, "সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করি— ভারত পুণ্যভূমি, কর্মভূমি। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও দেশ থাকে, যাহাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, যদি এমন কোনও স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে— যেখানে ঈশ্বরের অভিমুখী জীব মাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্ত ভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে— যদি এমন কোনও দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি— এই ভারতবর্ষ।" (বাণী ও রচনা, ৫/৭২)

স্বামীজী বলেছেন, "চরিত্রই প্রকৃত শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অর্থ সেই চরিত্র-শক্তি অর্জন করা।" সঙ্ঘের প্রার্থনায় দ্বিতীয় স্তবকে সর্বশক্তিমানের কাছে জ্ঞান, চরিত্র আর বিশ্বের অজেয় শক্তির জন্য আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে।

"জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করে তুলবে। আমরা চাই— জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ ওঠো, জাগো!" (বাণী রচনা, ৭/২০৩)

শক্তির জন্য স্বামীজীর নির্দেশ— "শক্ত হইয়া দাঁড়াও, শক্তিমান হও... ধর্ম বলিতে আমি ইহাই জানি।" (বাণী রচনা, ৮/২৯২)

আবার বলেছেন— "আমাদের বল চাই। আমরা ভারতবাসী, অন্য সব জাতির চেয়ে আমাদের বেশি প্রয়োজন বলিষ্ঠ এবং শক্তিসম্পন্ন চিন্তা।" (জীবন ও বাণী - ১০৩) "জীবনের পরম সত্য এই : শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন। দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ ; দুর্বলতাই মৃত্যু।" (আমার ভারত - অমর ভারত, ১০০)

জ্ঞানের অর্থ হল বিচারশক্তি— "জুয়াচোর ও ঠগের কাছে প্রতারিত হওয়া অপেক্ষা অবিশ্বাসী থাকিয়া মরাও ভাল। ব্যবহার করিবার জন্য আপনাকে বিচারশক্তি দেওয়া হইয়াছে। দেখান, আপনি উহার যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন।" (বাণী ও রচনা - ৪/১২৪)। এখানেই শেষ করেননি, স্বামীজী বলেছেন— "তেজ, বীর্য, জীবনীশক্তি, আশা, স্বাস্থ্য এবং যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহার লক্ষণই হইল শক্তি।" (বাণী ও রচনা - ৪/২৭২)। বলেছেন— "প্রবাদবাক্য বলে 'জ্ঞানই শক্তি' তাই না? জ্ঞানের ভিতর দিয়েই শক্তি লাভ হয়।"

সঙ্ঘের প্রার্থনা যেন জাতি নির্মাণে স্বামীজীর ভাবনার এক ছন্দবদ্ধ রূপ। এমন রূপেই যেন তিনি তাঁর প্রিয়তম সমাজকে দেখতে চেয়েছিলেন। সঙ্ঘের প্রার্থনায় বলা হয়েছে— জীবনে উৎকর্ষ লাভে মঙ্গলের সাধনাই বীরব্রত। স্বামীজী বলেছেন— "যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই মনে হয় বীরত্বের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। ইহাই আমার নতুন বাণী।" (বাণী ও রচনা - ১০/২১৭)

লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য করার নাম হল 'ধ্যেয় নিষ্ঠা', যা সঙ্ঘের প্রার্থনায় বলা হয়েছে। একই কথা অন্যভাবে বলেছেন স্বামীজী— "It is better to wear out than rust out" পড়ে থেকে

মরচে ধরে নষ্ট হওয়ার থেকে ঘষে ঘষে শেষ হওয়া অনেক ভালো। (বাণী ও রচনা, ৯/১০০)

স্বামীজী বলেছেন, "সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যাবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যাবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন করো। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।" (বাণী ও রচনা, ১/২১১)

"ধৈর্য্য, পবিত্রতা, অধ্যাবসায়"— এই তিনটি গুণ স্বামীজী একসঙ্গে দেখতে চেয়েছিলেন। সঙ্ঘের শাখাতে, প্রার্থনাতে প্রতিনিয়ত তার অভ্যাস হয়ে চলেছে। সঙ্ঘের প্রার্থনায় বলা হয়েছে—

"বিজেত্রী চ নঃ সংহতাঃ কার্যশক্তির্ - বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্
পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্ - সমর্থা ভবত্বাশিষা তে ভৃশম্।।"

বিজয়শালিনী সংগঠিত সংহত কার্যশক্তির সাহায্যে 'ধর্মের' রক্ষা দ্বারাই রাষ্ট্রকে পরমবৈভবশালী করতে পারি। ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "ধর্মেই ভারতের জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জ্ঞান না ভুলে যাচ্ছে, ততদিন জগতে কোনও শক্তি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।" (বাণী ও রচনা ৭/৯৮, আমার ভারত - ১৪৪)

"ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারতভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ সর্বত্র এক ধর্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম একথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খৃস্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান আমি সে হিসাবে এক ধর্ম কথা ব্যবহার করিতেছি না।" (বাণী ও রচনা, ৫/১৮৩)

সঙ্ঘ যে 'ধর্মে'র রক্ষার কথা বলে তা হল কর্তব্য। ভারতমাতার সন্তান হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা, স্বামীজীর ভাষায় 'ভারতকে ভালোবাসো।'

ভারতকে ভালোবাসার অর্থ আরও স্পষ্ট ভাষায় স্বামীজী প্রকাশ করেছেন "হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী। ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী। বলো ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;

আর বলো দিনরাত— হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো। আমায় মানুষ করো।" (বাণী ও রচনা, ৬/১৯৪) ধর্মের রক্ষার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করে স্বামীজী বলেছেন— "এখনও আমাদের জগতকে শেখাবার কিছু আছে। এজন্যই শত শত বছরের অত্যাচার এবং প্রায় হাজার বছরের বৈদেশিক শাসনের পীড়া সত্ত্বেও এই জাতি এখনও জীবিত আছে। এই জাতি এখনও জীবিত, কারণ এখনও এই জাতি ঈশ্বর ও ধর্মরূপ মহারত্নকে পরিত্যাগ করেনি।" (বাণী ও রচনা, ৫/৩০)। সেই একই কারণে ধর্মের রক্ষার মাধ্যমেই সঙ্ঘ দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে চায় যা স্বামীজীও চেয়েছিলেন—

"কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির ক্ষেত্রে ধর্ম, একমাত্র ধর্মই হল তার জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। আমাদের জীবন-প্রাসাদের মূল ভিত্তি এই ধর্মের উপরেই স্থাপিত।" (বাণী ও রচনা, ৫/৫০)

এটাই হল ধর্মের রক্ষা। এর দ্বারাই দেশকে পরম বৈভবশালী করা সম্ভব।

দেশকে পরম বৈভবশালী করতে চায় সঙ্ঘ— কিন্তু পরম বৈভবশালী কথার অর্থ কী? দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানো। শুধু বস্তু জগতের দিক থেকেই নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাবার নামই হল পরম বৈভব প্রাপ্তি।

পরমবৈভবের বর্ণনা স্বামীজী যে ভাষায় করেছন— তারপর অন্য কোনও বর্ণনার আর প্রয়োজনই নেই। স্বামীজীর বর্ণনায়— "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয় পতাকা নিয়ে নয়; শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষা পাত্রের শক্তিতে। ... আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই দেশজননী আবার জেগে উঠেছেন। নবজীবন লাভ করে আগের চেয়েও অনেক বেশি গৌরবময় মূর্তিতে তিনি তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট। শান্তি ও আশীর্বাণীর সঙ্গে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।" (The complete works of Swami Vivekananda - Vol. IV, P - 352-53, 5/465)।

ভারতের ভবিষ্যত কেমন হবে— স্বামীজী বলেছেন— "প্রাচীন কালে ঢের ভাল জিনিষ ছিল, খারাপ জিনিষও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে। কিন্তু আসছে যে ভারত — Future India - Ancient India-র অপেক্ষা অনেক বড়

হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India - সত্যযুগের আবির্ভাব।" (বাণী ও রচনা, ৭/৭২)

"এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা তত জোরে ওঠে। এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি— পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে। সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই?" (স্বামী-শিষ্য সংবাদ, বাণী ও রচনা, ৯/৮৪)

সঙ্ঘের প্রার্থনার একেবারে অন্তিমে রয়েছে জয়ঘোষ— "ভারতমাতা কী জয়" অর্থাৎ ভারত মাতার জয় হোক। সঙ্ঘের প্রতিটি স্বয়ংসেবকের যা সুস্পষ্ট লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জয় নয়, জয় নয় কোনও নেতার বা দলের। জয় হোক ভারত মাতার। 'ভারত মাতা কী জয়' বলা আমাদের এক ভাবী কর্তব্যের প্রতি আহ্বান জানায়। কেবলমাত্র মুখস্ত করা শ্লোগান বা ধ্বনি নয়। ভারতমায়ের জয়ের জন্য নিজ কর্তব্য সম্পাদন করা, সমর্পণ করা, নিজেকে প্রস্তুত করা।

স্বামীজী যেমন বলেছেন— "আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী 'ভারতমাতাই' আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।" (বাণী ও রচনা, ৫/১৯৮-১৯৯) আজ বহু মানুষের সঙ্ঘ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, সন্দেহ রয়েছে। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সমালোচকরা সঙ্ঘের নিন্দায় পাতার পর পাতা প্রবন্ধ লেখেন, ঘন্টার পর ঘন্টা ভাষণে ব্যয় করেন— স্বামীজী যেন জানতেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে। তাই যেন সঙ্ঘের পক্ষ থেকেই তাদের জন্য উত্তর রেখে গেছেন স্বামীজী—

"হে আমার ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী দেশপ্রেমিকগণ, তোমরা হৃদয়বান হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ— কোটি কোটি লোক অনাহারে মরছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরে অর্ধাসনে কাটাচ্ছে। তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ— অজ্ঞতার কালো মেঘ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? এই সব ভাবনা কি তোমাদের অস্থির করে তুলেছে? তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই ভাবনা কি তোমাদের

পাগল করে তুলেছে? দেশপ্রেমিক হবার এই হল প্রথম সোপান। মানলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করার কোনও উপায় বের করেছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করে কোনও কার্যকর পথ বের করেছ কি? দেশবাসীকে গালি না দিয়ে তাদের যথার্থ কোনও সাহায্য করতে পার কি? শুধু তাই নয়, তোমরা কি পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে কাজ করতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হাতে তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তথাপি তোমরা যা সত্য বলে বুঝেছ তাই করে যেতে পার কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি তোমরা যা সত্য বলে বুঝেছ, তাই করে যেতে পার কি? ... তোমাদের কি এরকম দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করতে পার।" (আমার ভারত - অমর ভারত, ৩৩)

ভারতমাতার জয় কিভাবে সম্ভব তারও স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন স্বামীজী— ভারতমাতার জয় যে অবশ্যই হবে তার ইঙ্গিতও স্বামীজী দিয়েছেন— "যে অন্ধ সেই শুধু দেখতে পাচ্ছে না, যে বিকৃত মস্তিষ্ক কেবল সেই বুঝতে পারছে না— আমাদের মাতৃভূমি জাগছেন। গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করে আমাদের মাতৃভূমি জেগে উঠছেন। আর কেউই তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আর কখনোই ইনি নিদ্রিত হবেন না। কোনও বহিঃশক্তিই আর এঁকে দমন করে রাখতে পারবে না।" (আমার ভারত - অমর ভারত, ৪১)

।। সঙ্ঘের কার্যক্রমের রূপরেখা ও স্বামীজী।।

"নিজেকে একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।" (বাণী ও রচনা, ৪/২৬৮)

শুধু নিজেকেই নয়, সমগ্র সংগঠনকেই (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। সঙ্ঘের বিচারধারা, আদর্শবাদ, ব্যবহারিক গুণ গ্রহণ করে নিজেদের পবিত্রতা ও সামর্থ দিয়ে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে অগ্রবর্তী সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও সঙ্ঘের প্রতিটি কার্যক্রমের রূপরেখা যেন স্বামীজীর ইচ্ছা ও নির্দেশেই নির্ধারিত হয়েছে। ভারতের মত বিশাল জনসংখ্যার দেশে বহু ভাষা-ভাষী মানুষের গ্রহণযোগ্য একমাত্র ভাষা কি হতে পারে? স্বামীজী বলেছেন— "এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততি স্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা, ইহাই ভাষা সমস্যার একমাত্র সমাধান।" (বাণী ও রচনা, ৫/৩৭০)

সঙ্ঘের শাখায় প্রতিটি আজ্ঞা বা আদেশ সংস্কৃত ভাষায় দেওয়া হয়। নিতান্ত বালক-কিশোর পর্যন্ত সেই নির্দেশ দিতে ও বুঝতে পারে। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জাতীয় গৌরব বোধ নির্মাণ ও সংস্কার দান দুটোই যে সম্ভব তা বলেছেন স্বামীজী।

সংস্কৃত সম্পর্কে স্বামীজীর বিপুল আগ্রহ ছিল— "তোমরা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? আমি তোমাদিগকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলাভের ইহাই রহস্য। (বাণী ও রচনা, ৫/১৯৬)

সঙ্ঘের বিবিধ সংগঠন— 'সংস্কৃত ভারতী'র মাধ্যমে আজ সংস্কৃত ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। সাধারণ মানুষও আজ সংস্কৃত শিখতে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছেন। কারণ — "ভারতে সংস্কৃত ভাষা ও মর্যাদা সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সাহসী হইবে না।" (বাণী ও রচনা, ৫/১৯৬) "কারণ, সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"

জাতির মধ্যে সেই শক্তি ও গৌরবের ভাব জাগ্রত করার কাজই সঙ্ঘ নিত্য প্রতিদিনের শাখার মাধ্যমে করে চলেছে।

।। অস্পৃশ্যতা।।

সঙ্ঘের ১ ঘন্টার শাখায় প্রতিদিন বিভিন্ন খেলাধূলা, শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধক গান, সুভাষিত, অমৃতবচন (মহাপুরুষের বাণী) পাঠ করা হয়ে থাকে। স্বয়ংসেবকদের অনেকেরই একটি সুভাষিত কণ্ঠস্থ হয়ে যায়—

"হিন্দবঃ সোদরা সর্বে নঃ হিন্দু পতিতো ভবেৎ
মম দীক্ষা হিন্দু রক্ষা মম মন্ত্র সমানতা।"

— সকল হিন্দু ভাই-ভাই, হিন্দু কখনও পতিত হতে পারে না। আমার দীক্ষা হল হিন্দুত্বের রক্ষা — সমানতাই আমার মন্ত্র।

শুধু কণ্ঠস্থ করাই নয়, ব্যক্তি জীবনেও এই মন্ত্র প্রয়োগ করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। এই কথাগুলি যেন স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি— "হিন্দু মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না ছোঁব না' বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে— তোরাও আমাদের মতো মানুষ। তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে। (বাণী ও রচনা, ৯/৭৮)

জাত-পাত, ছু-অচ্ছুৎ-এর বিরুদ্ধে কষাঘাত করেছেন স্বামীজী। "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁতমার্গ - আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র....।"

"ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে, হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়— ছুঁৎমার্গে, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যস! এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না।" (বাণী ও রচনা, ৭/৫৫ ও ৭২)

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস বলেছেন— "যদি অস্পৃশ্যতা অপরাধ না হয় তবে পৃথিবীতে কোনও কিছুই অপরাধ নয়।"

সঙ্ঘের মধ্যে কখনও জাত-পাতের বিভেদ ছিল না। সঙ্ঘের শাখায় এলে সকলেই হিন্দু হয়ে যায়। অন্য কোনও পরিচয় থাকে না।

।। স্বামীজী — সেবা, শিক্ষা ও সঙ্ঘ।।

"যদি একজনের মনে এ সংসার নরককুণ্ডের মধ্যে একদিনও একটু আনন্দ ও শান্তি দেওয়া যায়, সেইটুকুই সত্য। এই তো আজন্ম ভুগে দেখেছি— বাকি সব ঘোড়ার ডিম।" (বাণী ও রচনা, ৮/২৪০)

সংগঠন হিসাবে সঙ্ঘ কেবলমাত্র ভারতমাতারই পূজা করে। সমাজরূপী ঈশ্বরের পূজার মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা নিজেদের কৃতার্থ করে। দয়া নয়, দাক্ষিণ্য নয়। 'নর সেবাই নারায়ণ সেবা'— বলেছেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা। সমাজের দীন-দুঃখী, অসহায় মানুষের পূজা— স্বামীজী বলেছেন— "আহা, দেশে গরীব দুঃখীর

জন্য কেউ ভাবে না রে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে তেমন কেউ নেই রে।" স্বামীজী যেমন চেয়েছিলেন ঠিক তেমন ভাবেই সঙ্ঘের সেবা-ভাবনা। সেবার মাধ্যমে সংস্কার, স্বাবলম্বন, স্বাভিমান জাগিয়ে সমাজকে বলশালী করা, ধর্মান্তরকরণের সুযোগ চিরতরে বন্ধ করা। হিন্দু সমাজের ধর্মান্তরণ স্বামীজীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। স্বামীজী বলেছেন— "এই দেখ না, হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চান হয়, হয় আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে"। (বাণী ও রচনা, ৯/১৪৯)

ধর্মান্তরণের প্রতিকারের কথাও বলেছেন স্বামীজী— "অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে। নইলে কৃশ্চানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে।" (বাণী ও রচনা, ৮/৭০)

পরাবর্তন অর্থাৎ নিজ ধর্মে ফিরে আসা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "আর এক কথা, তাহাদের পুনর্গ্রহণ না করিলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইবে। যখন মুসলমানরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে, ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর কোনও লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়; একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়।" (বাণী ও রচনা, ৯/৩১৪)

স্বামীজীর বাণী তথা নির্দেশকেই পাথেয় করে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম', 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ', 'ধর্ম জাগরণ বিভাগের' মাধ্যমে নিয়মিত পরাবর্তনের অর্থাৎ শত্রু কম করার কাজ চলছে।

স্বামীজী বলেছেন— "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা।" (৬/৩৪১)

জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য তাঁর পরিকল্পনা ছিল— "ধরুন, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই, তবু দরিদ্র ঘরের ছেলেরা সেসব স্কুলে পড়িতে আসিবে না। তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জনের জন্য হালচাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ, না

আছে ইহাদিগকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করিবার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটি নৈরাশ্যজনক বলিয়াই মনে হয়। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছতে না পারে তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।" (৬/৩৪৭)

শিক্ষাকে লোকের কাছে পৌঁছাবার জন্য 'বনবন্ধু পরিষদ', 'মানব সেবা প্রতিষ্ঠান' বা 'বিদ্যাভারতী'র নিঃস্বার্থ, সৎ, শিক্ষিত আদর্শবাদী ব্যক্তির মাধ্যমে পাহাড়ে, জঙ্গলে, শহরের বস্তিতে হাজার হাজার 'One Teacher, one School' একজন শিক্ষক — একটি বিদ্যালয় বা একল বিদ্যালয় শুরু হয়েছে। ছোট ছোট বিদ্যালয়গুলি থেকে শিশু, বালক বা বয়স্করাও শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন স্বামীজী চেয়েছেন সবল শরীর, সুস্থ মন আর আমিও এই সমাজের অঙ্গ— এই সমাজকে ভালবাসা আমার কর্তব্য এমন মানসিকতা নির্মাণের 'ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত' করার শিক্ষাই এই বিদ্যালয়গুলিতে দেওয়া হয়। সেগুলি কেবল চূড়ান্ত কেরানি গড়ার কল নয়, স্বামীজী বলেছেন— "ছোট ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।.... রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে আর কতকগুলি ইংরাজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছেলেদের পড়াতে হবে।" (৯/৪০৫)

"তাই হবে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে।"

সেই সময় ভারতে প্রচলিত শিক্ষা (যা আজও প্রচলিত) সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য— "মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে, বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাতপুরুষ চুলোয় যাক— তিন পুরুষের নামও জানে না।" (৯/২৫৮)

এমন মেকলেপন্থী শিক্ষার দ্বারা দেশের কোনও কল্যাণ সাধিত হবে না, তা বুঝেছিলেন স্বামীজী।

শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা, নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করার মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেই আজ সারা দেশে বিদ্যাভারতীর বিশ হাজারের বেশি বিদ্যালয়ের

মাধ্যমে 'যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়' তারই প্রয়াস চলছে।

।। স্বামীজী, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ ও সঙ্ঘ।।

দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতার কাজই হল সঙ্ঘকে আক্রমণ করা। রাজনৈতিক দলগুলির মতাদর্শ বিভিন্ন হলেও, ক্ষমতা দখলের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করলেও, সঙ্ঘকে আক্রমণের সময় তাদের ভাষা কিন্তু একটাই, তা হল— সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক, মুসলিম-বিরোধী।

কি কারণে সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক, তা তারা প্রমাণ করতে পারে না। সঙ্ঘকে যারা সাম্প্রদায়িক বলেন, তারা কি স্বামীজীকেও সাম্প্রদায়িক বলবেন? স্বামীজী বলেছেন— "এখন লক্ষণীয় যে, মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত, সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোনও পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী — তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে, যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। যে কোনও গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।" (complete work, Vol. IV, 125-126)।

অর্থাৎ যা সত্য তা বলতে স্বামীজী সংকোচ বোধ করেননি। কারণ, তাঁর মুসলমান ভোটের প্রয়োজন ছিল না। যা সত্য তা সব সময়ই সত্য। ভোট দিয়ে সত্য নির্ধারণ করা যায় না। সত্য একজন বললেও সত্য, কেউ না বললেও সত্য। অনেকে আছেন যারা বলেন— আমরাও হিন্দু, কিন্তু আমরা আর এস এস-এর হিন্দুত্বে নয়, স্বামীজীর হিন্দুত্বে বিশ্বাস করি, আস্থা রাখি। তাদের জন্য স্বামীজীর সাবধান বাণী— "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য হয় না।" (৯/৪৬) নিজেদের অক্ষমতা, কাপুরুষতা ঢাকবার জন্য যারা স্বামীজীর আশ্রয় খোঁজে, তাদের জন্য এই ছিল স্বামীজীর পরামর্শ— "যদি তুমি অন্য কোন দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার

জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বলো, দেখিবে তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন— ভারতের নিকট পৃথিবীকে এখনও এ পরধর্মসহিষ্ণুতা, শুধু তাহাই নহে, পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।" (বাণী ও রচনা, ৫/১৩)

যারা স্বামীজীর হিন্দুত্বে বিশ্বাস করেন, তারা কি স্বামীজীর এই আশা পূরণ করার জন্য বাহু প্রসারিত করবেন? "মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশি হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিনদিন আরও কমিয়া যাইবে। শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দু জাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শতদোষ সত্ত্বেও পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও, এখন তাহারা যে সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল আধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈত-তত্ত্ব বিলুপ্ত হইবে। অতএব ওঠ, জাগো, পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।" (বাণী ও রচনা, ৫/৩৪০)

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর জাগ্রত তরুণ ভারতের রোষে চারশত বৎসরের এক জর্জর অপমানের চিহ্ন অপসারিত হয়েছিল। তার জন্য বলি দেওয়া হয়েছিল সঙ্ঘকেই। সেই অবলুপ্ত অপমানের চিহ্নের জন্য আজও বহু মানুষের শোকাশ্রু ঝরে পড়ে। দিনটিকে কেউ কেউ কালা দিবস হিসাবেও পালন করে। আজ সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণিত, রামমন্দির ভেঙ্গেই বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল— বিধর্মীদের দ্বারা ভেঙ্গে ফেলা মন্দির সম্পর্কে কি ছিল স্বামীজীর চিন্তা? — "বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙ্গিয়াছে— কিন্তু এই অত্যাচার স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেইখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পারো, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মতো দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, ঐ মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরভ্যুদয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে— বারবার নষ্ট হইতেছে, আবার সেই

ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নতুন জীবন লাভ করিয়া পূর্বেরই মতো অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে।" (বাণী ও রচনা, ৫-১৮৫-১৮৬)

শ্রীরাম অযোধ্যায় অচল-অটলভাবে বিরাজ করছেন, কিন্তু পূর্বের মত নয়। শ্রীরাম মন্দির সেখানেই নতুন জীবন লাভ করবে। ভব্য রামমন্দির নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কাশ্মীর ভ্রমণকালে ক্ষীরভবানী মন্দির দর্শনের পর স্বামীজী তাঁর মনের ভাব শিষ্যের কাছে প্রকাশ করেছিলেন— "মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কতকাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন। পুরাকালে যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল অথচ এখানকার লোকগুলো কিছু করিল না। হায়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না।" (বাণী ও রচনা, ৯/৫৬)

সেই সময়ের ও আজকের রাজনৈতিক নেতাদের মত ভারত যে মিশ্র সংস্কৃতির দেশ তাও মানতেন না স্বামীজী— "তোমরা শুনিয়াছ, পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই নিজেকে সার্বভৌম বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। প্রথমত আমি বলিতে চাই যে সম্ভবতঃ কোন ধর্মই কোনকালে সার্বভৌম ধর্মরূপে পরিগণিত হইবে না। কিন্তু যদি কোনও ধর্মের এই দাবি করিবার অধিকার থাকে, তবে আমাদের ধর্মই কেবল এই নামের যোগ্য হইতে পারে, অপর কোন ধর্ম নহে। (বাণী ও রচনা, ৫/১৭৫)

।। স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা ও সঙ্ঘ।।

Mass-কে জাগাবার কাজ করতে পারলে তবেই দেশের কল্যাণ— ভারতের কল্যাণ; কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা— এই লক্ষেই সঙ্ঘ রাষ্ট্র জাগরণের কাজ বেশ কয়েকবার করেছে। সে জাগরণের কাজ কখনও রাজনৈতিক ছিল না, তা ছিল ধর্মকে আধার করেই।

"ভারতের নিশ্চল ধর্মকে গতিশীল করতে, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে, এই জাতির সাধারণ উত্তরাধিকার এবং জন্মগত সর্বজনীন স্বত্ত্বরূপে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে মুক্ত হস্তে নিয়ে যাবার জন্য" দেশব্যাপী একাত্মতা-যাত্রা, রামশিলা-পূজন, রাম-জানকী রথযাত্রা, গো-গ্রামযাত্রা, হনুমত শক্তি জাগরণ মহাযজ্ঞ সংগঠিত হয়েছে... যা স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল— "আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—

মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে— সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পারলে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হোল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে— মুক্তিফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে।" (বাণী ও রচনা, ৯/১৭০)

ভারতের যে ইতিহাস বিদেশীরা তৈরি করে ছিল, তাতে এতটুকুও আস্থা ছিল না স্বামীজীর। তিনি বলেছেন— "ইংরেজরা আমাদের দেশের যে ইতিহাস লিখেছে, তাতে আমাদের মনে দুর্বলতা না এসে যায় না। কেননা, তারা শুধু আমাদের অবনতির কথাই বলে। যে সব বিদেশীরা আমাদের রীতিনীতির, আমাদের ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত, তারা কেমন করে বিশ্বাস্য ও নিরপেক্ষ ভাবে ভারতের ইতিহাস লিখবে? কাজেই স্বভাবতঃই বহু ভ্রান্ত ধারণা ও অপসিদ্ধান্ত এসে পড়ছে।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড,৩১২)

স্বামীজীর পরামর্শ ছিল— "ভারতের ইতিহাস ভারতীয়গণকেই রচনা করতে হবে। নিজস্ব স্বাধীন পথ গড়ে তুলতে হবে।" রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রেরণায় বাবাসাহেব আপ্তে স্মারক সমিতি সঞ্চালিত 'ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা' ভারতের গত পাঁচ হাজার বছরের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসের খোঁজ ও গবেষণার দ্বারা ভারতের গৌরবময় অতীতকে জনমনে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে রত। এ যেন স্বামীজীর ইচ্ছারই কৃতিরূপ।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, একটি মন্দির নির্মাণ করতে, কোনও দেবতার মন্দির নয়, হিন্দু সমাজের সব সম্প্রদায়ের জন্য সে মন্দিরের দ্বার অবারিত থাকবে। "আমরা যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলিতেছি, উহা অসাম্প্রদায়িক হইবে। ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ওঙ্কারেরই কেবল উপাসনা হইবে। যদি কোনও সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপসনায় আপত্তি থাকে, তবে তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার কোনও অধিকার নাই।" (বাণী ও রচনা, ৫/২০০)

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ছোট ছোট শাখার মাধ্যমে এমনই ভারতমাতার মন্দির নির্মাণ করে চলেছে। সে মন্দিরে উপাস্য কেবল ভারতমাতাই। যদি কারও ভারতমাতার আরাধনায় আপত্তি থাকে, তবে তার নিজেকে ভারতীয় বলার কোনও অধিকারই নেই।

স্বামীজীর চিন্তন, বাণী ও ইচ্ছার সার্থক রূপায়ণ করছে সঙ্ঘ। স্বামীজীর মত সঙ্ঘ বিশ্বাস করে, " আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল। তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত।"

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সঙ্ঘের উপর নেমে এসেছে আক্রমণ। জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, চরিত্র নির্মাণের কর্মধারাকে বন্ধ করতে অকারণে বারবার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অত্যাচার, নিপীড়নের 'রোলার' চালানো হয়েছে। কিন্তু দমিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা জানে "ধৈর্য্য, পবিত্রতা, অধ্যাবসায়ের জয় হবে।"

স্বামীজী বলেছেন, "বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই। সিদ্ধিও নাই।" (বাণী ও রচনা, ৬/৯২)

সব বাধাকে তুচ্ছ করে সঙ্ঘ তার লক্ষ্যপথেই এগিয়ে চলেছে— আর কোনও শক্তিরই ক্ষমতা নেই তাকে পরাস্ত করে। কারণ সঙ্ঘ স্বামীজীর চিন্তারাশিকেই বাস্তবায়িত করছে। স্বামীজী আশীর্বাদ করে বলেছেন—

"সনাতন হিন্দু ধর্মের জয় হোক, মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ। আমরা নিশ্চিত জয়লাভ করব।" (৬/৪১৯)